তারিখ 24 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

সমকাল

# অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক স্কুল

প্রবাসীয়া

মো. মাসুদ পারভেজ রানা

মেয়ের স্কুলে লেখাপড়ার সুবাদে কিছুটা হলেও অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক স্কুলের কার্যক্রম সম্বন্ধে ধারণা হয়েছে। বাংলাদেশের স্কুলগুলোর কার্যক্রমগুলো অস্ট্রেলিয়ার নিয়ম-কানুন থেকে আলাদা। প্রথমেই যে বিষয়টি বোধগম্য তা হলো, ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সঙ্গে পিতামাতা-অভিভাবকের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ। এই যোগাযোগ শুধু ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া আর নিয়ে আসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। টার্ম বা সেমিস্টার শেষে ক্লাস শিক্ষকের সঙ্গে অগ্রগতি বিষয়ে অভিভাবকদের সম্মিলিত ও পৃথক পর্যালোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হয় বাড়ির কাজগুলো যেন পিতামাতার সান্নিধ্যে করে। অভিভাবকদের সঙ্গে অগ্রগতি পর্যালোচনা আর প্রত্যেক সপ্তাহের বাড়ির কাজ থেকে ছেলেমেয়েদের অগ্রগতি ও দুর্বলতা সহজেই অনুধাবন করা যায়। ক্লাস শিক্ষক রীতিমতো গবেষণা করে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর দুর্বলতাগুলো ধরিয়ে দেন এবং সে ক্ষেত্রে পিতামাতার করণীয় সম্বন্ধেও ধারণা দিয়ে থাকেন।

আমাদের পিতামাতারাও স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেননি যে তা নয়। কিন্তু তাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা আর করণীয় বিষয়ক ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমাদের অভিভাবকরা শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে বলতেন, 'এই যে আপনার ছাত্র, আপনাকে দিয়ে গেলাম, চামড়া-মাংসগুলো আপনার আর হাড্ডিগুলো আমার।' অর্থাৎ পড়াশোনায় ফাঁকি দিলে পিটিয়ে সোজা করার সর্বোচ্চ ক্ষমতা শিক্ষকদের দেওয়া হতো। এমন উদাহরণ

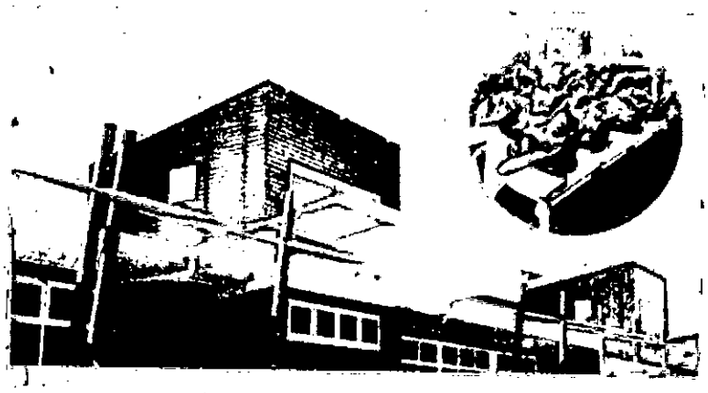

হয়তো এখন নেই; কিন্তু ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সার্বক্ষণিক অগ্রগতি দেখভালের জন্য আমরা কতটুকু সজাগ হতে পেরেছি তা প্রশ্নসাপেক্ষ। অভিভাবক হিসেবে আমাদের কর্তব্য স্কুলের গেট পর্যন্ত যাওয়া-আসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি কাজ করার বদলে অভিভাবকরা অতিমাত্রায় প্রাইভেট শিক্ষকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। ফলে প্রাইভেট শিক্ষকদের পাওনা শোধের অতিরিক্ত টাকা জোগাড়ের জন্য অভিভাবকরা অতিরিক্ত উপার্জনের তাগিদবোধ করেন অথবা প্রাইভেট পড়ানোর টাকা নেই ভেবে হাল ছেড়ে বসে থাকেন। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এখানে ট্যাক্সিচালক আর আরোহী দু'জনেরই ছেলেমেয়েরা একই স্কুলে পড়ে এবং তারা সমান দায়িত্বশীলতার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেন।

আমার বয়সী অনেকের হয়তো এখনও স্কুল ফাঁকি দেওয়ার চরম আনন্দময় মুহূর্তগুলো মনে আছে। নানা কৌশলে স্কুলে না যাওয়ার বাহানা খোঁজায় ছিল ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম কাজ। কিন্তু এখানে ছাত্রছাত্রীরা ঘরে বসে থেকে অথবা সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে স্কুলে যাওয়া বেশি আকর্ষণীয় মনে করে। কারণ হলো : এক. স্কুলের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে লেখাপড়া ছাড়াও খেলাধুলার সুযোগ থাকে; দুই. পুরস্কার (অ্যাওয়ার্ড) পাওয়ার তাগিদ এবং তিন. ভালো ফলের মাধ্যমে ভালো স্কুলে চান্স পাওয়ার সুযোগ। এগুলোর মধ্যে পুরস্কার পাওয়াটাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নেই বললেই চলে। প্রতিদিনের ভালো ফল-অগ্রগতির জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়। নির্দিষ্টসংখ্যক পুরস্কার পেলে দেওয়া হয় প্রিন্সিপালের সঙ্গে চা খাবার সুযোগ এবং বছর শেষে বিশেষ সার্টিফিকেট।

স্কুলগুলোতে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, শিক্ষকদের সহজ-স্বাভাবিক আচরণ। একবার প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করার জন্য স্কুলের অফিসকক্ষে গিয়েছিলাম। প্রিন্সিপাল নিজেই কয়েকটি টিস্যু পেপারের বান্ডিলসহ বাইরে এসে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন তার অফিসকক্ষে। ঘড়িতে তখনও আমাকে দেওয়া সময়ের চেয়ে পাঁচ মিনিট কম। দুই মিনিট বসতে অনুরোধ করে তিনি বের হয়ে গেলেন। বোঝা গেল তিনি বান্ডিলগুলো অফিসের ওয়াসরুমগুলোতে ব্যবহারের জন্য রাখতে যাচ্ছেন। আমি তখন ভাবছিলাম, একজন প্রিন্সিপালের কি এই কাজটি মানায়! বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই না। অথচ তিনি বাসার কাজের মতোই অফিসের সমস্ত কাজ নিজ হাতে করছেন। একজন শিক্ষক হিসেবে বিষয়গুলো দেখলে আমাদের দুর্বলতাগুলো খুঁজে পাই। এতটা স্বাভাবিক নির্মোহ হওয়াটায় হয়তো শিক্ষক জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া। একদিন আমরাও পারব, এই আশা রাখছি।

• শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী
mprgesru@yahoo.com